Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-I, July 2017, Page No. 1-15
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পিতা-পুত্র ও প্রকৃতি : রবির ছটায়, বিভূতি-অন্তরাগে

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, নহাটা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা

Abstract

The essence of relationship in between father and son is eternal. In our bengali society the role of father is commonly reflect the attitude of his son. This has been also merged in the way of various eventual phenomenon of bengali literature as well as bengali short stories also. Rabindranath Tagore had found the foot-mark of his father Debendranath as a part of his philosophical idea. The thought process, style of writing, allegorical deconstruction of Taradas Bandyopadhyay was being built as much as by the literary way of Bibhutibhusan too. To some extent, Rabindranath and Taradas both were being remoted by the iconic image of Debendranath and Bibhutibhusan actively or passively. Both the writer started to feel the nature from their childhood which was nurtured by the inspiring shadow of their parent. In my article, I want to draw and analyze the meaningful influence in connection to the realisation of nature of Debendranath and Bibhutibnusan in to the livelihood and creations of their son, Rabindranath and Taradas.

ভেরা পানোভার লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'পিতা ও পুত্র'। গল্পের সেরিওজার বয়স ছয় বছর। বাপ তার মারা গেছে যুদ্ধে। কিন্তু মা আছে তার, আছে পাশা মাসী আর লুকিয়ানিচ। তা ছাড়াও আছে তার দিনের পর দিন ধরে ভেবে ওঠা কত ভাবনা, কত অভিজ্ঞতা— কেননা সেরিওজার জীবনের প্রতি দিনই ঘটে চলেছে কত আশ্চর্য সব ঘটনা! তারপর একদিন সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্য ঘটনাটাই ঘটল তার জীবনে। সেরিওজার নতুন বাবা এলেন। দিমিত্রি র্নেয়িভিচ করোস্তেলিওভ এলেন সেরিওজার বাবা হয়ে। বই পড়তে সবচেয়ে ভালবাসত সেরিওজা। বইয়ের চাইতেও ধীরে ধীরে করোস্তেলিওভ বেশি প্রিয় হয়ে উঠলো তার কাছে। বাবার কাঁধে চড়ে আর গলা জড়িয়ে ধরে বাড়ি ফেরার অপার্থিব আনন্দের স্বাদ পেলো সেরিওজা তার জীবনে প্রথমবারের মতো। একমাত্র করোস্তেলিওভই হয়ে উঠলেন তার সেই মনের মানুষ যে প্রথম অমলিন শৈশবের হাজারো কল্পনায় ঘেরা সেরিওজার সকল কথা শুনলো অনেক দরদ দিয়ে, খামখেয়ালিপনা সহ্য করল অবাধ। নিখাদ স্নেহ আর অব্যক্ত ভালবাসায় সবকিছু উজাড় করে, ভাগ করা দিনের দিনের টুকরো টুকরো রোজনামচায় পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক হয়ে উঠলো নিবিড় থেকে নিবিড়তর। বয়স্ক করোস্তেলিওভ নামের এই মানুষটি যে তার জীবনে দ্বিতীয় পিতা হয়ে এল তার সঙ্গে সেরিওজা নামের ছোট্ট ছেলেটির ভালোবাসা কী ভাবে গড়ে উঠলো চিরন্তন মানবীয় সম্পর্কের সেইসব কাহিনী নিয়েই লেখা গ্রন্থটি।

পিতা-পুত্র সম্পর্ক চিরন্তন। সব দেশে সব কালে তা সমান। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়ঃ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা।। আত্মার উৎস, চেতনার উদ্বোধক, পরম প্রিয়জন সেই পিতা—

যাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেও পরম সমীহজ্ঞানে সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রাখার স্বতঃসিদ্ধ প্রয়াসে ঋদ্ধ বাঙালি জীবন, তাঁকে নিয়ে জল্পনা আর কল্পনায় কখনও কখনও ভরে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের নীলাকাশও। কিন্তু শুধুমাত্র পিতৃস্মৃতিকথন ও বর্ণনই এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বরং যেমন করে কবির লেখা কবিতার প্রথম মরমী ছত্রে, শিল্পীর কল্পনায় আঁকা ছবির শেষ তুলির টানে, গল্পের গৌরবান্বিত গন্তব্যে, জীবনস্মৃতির নিতল উন্মিলনে উদ্বেল ভাবনারা বর্ণময় হয়ে পাখা মেলে মনের বিচিত্র পটে তেমনই ভাবে এক প্রখর অথচ পেলব, পরুষ অথচ প্রসন্ন, নীরব অথচ সর্বসুখময় অনুভূতি হয়ে ছড়িয়ে থাকে সেই ব্যক্তিত্ব—মহাজীবন থেকে মহাপ্রস্থানের পথে যাঁর অবিরাম অনুসন্ধান আর ভাবনার মাঝে তাঁকে মিলিয়ে দেবার স্বার্থেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমার আলোচনার শুরুটা রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল (১৮৬১) থেকে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃকাল পর্যন্ত (১৮৭৮) তাঁর জীবনে ব্রাহ্ম ধর্মপ্রবক্তা পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) একটা বড় আদর্শগত প্রভাব কাজ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী সারদাসুন্দরী দেবীর (১৮২৬-১৮৭৫) চতুর্দশ সন্তান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্র প্রভাবিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রায় সমস্ত সদস্যরাই ছিলেন আদি ব্রাহ্ম ধর্ম মতবাদের পৃষ্ঠপোষক।[১] রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু পিতার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করলেও পিতৃদেবের সশরীরী সান্নিধ্য থেকে কবি আবাল্যকাল থেকেই যারপরনাই বঞ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষেরা খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগে বসবাস করতেন। ১৮৭৫ সালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কবির মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ দেশভ্রমণের নেশায় বছরের অধিকাংশ সময়ই কলকাতার বাইরে অতিবাহিত করতেন। তাই ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল ভৃত্যদের অনুশাসনে। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন করে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়-শিক্ষায় অনাগ্রহী হওয়ায় বাড়িতেই গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অথবা বোলপুর ও পানিহাটির বাগানবাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৩ সালে এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তিনি কয়েক মাসের জন্য পিতার সঙ্গে দেশভ্রমণে বের হন। প্রথমে তাঁরা আসেন শান্তিনিকেতনে। তারপর পাঞ্জাবের অমৃতসরে কিছুকাল কাটিয়ে তাঁরা শিখদের উপাসনা পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। শেষে পুত্রকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ যান পাঞ্জাবেরই (অধুনা ভারতের হিমাচল প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত) ডালহৌসি শৈলশহরের নিকট বক্রোটায়। এখানকার বক্রোটা বাংলোয় বসে রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নিয়মিত পাঠ নিতে শুরু করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী যথাঃ কালিদাস রচিত ধ্রুপদি সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং উপনিষদ পাঠেও উৎসাহিত করতেন। পরবর্তীতে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ও বিবাহোত্তর জীবনে প্রবেশের পর সাহিত্য রচনার পাশাপাশি জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্বভারও কবির উপর অর্পিত হয়। ১৮৯১ সালে পিতার আদেশে নদিয়া (অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা), পাবনা ও রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার জমিদারিগুলির তদারকি শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। এ সময় কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অতিবাহন করেছিলেন এবং তাঁর গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পগুলিও এই সময়েই লেখা। আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনাও তাঁর লেখা গল্পগুচ্ছের পাঠ থেকেই এক নতুন অভিমুখ লাভ করতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে রবীন্দ্র জীবন সম্পর্কে আরো কিছু বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন।

পাঁচ সন্তানের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিন কন্যা ও দুই পুত্র। তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রী অতসীলতা দেবী 'মীরা', মধ্যমা শ্রী রেনুকা দেবী 'রানী' ও জ্যৈষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী 'বেলা' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যৈষ্ঠ পুত্র শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের কাউকেই স্কুলে বা কলেজে পাঠাননি রবীন্দ্রনাথ, অথচ তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের গোড়া থেকেই লেখাপড়া শেখানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের লেখাপড়ার বিভিন্ন সামগ্রী কিনে

এনে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচিত পরিজনদের লেখায় জানা যায় যে তিনি শমীর জন্য ড্রয়িং বুক, নিব ও হ্যান্ডেল, রেনুকার জন্য কথামালা, রথীর জন্য ভূ-প্রদক্ষিণ ও ইউরোপের মানচিত্র, মাধুরীলতার জন্য 'বীণাবাদিনী' পত্রিকা ও মীরার জন্য শিশু শিক্ষা, এটলাস ইত্যাদি কিনে আনতেন। তিনি পুত্র-কন্যাদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য নিয়োগ করেছিলেন তিনজন ইংরেজ শিক্ষিকা ও একজন ইংরেজ শিক্ষককে। বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার জন্য নিয়োগ করেছিলেন ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী জগদানন্দ রায়কে। বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে পুত্র-কন্যাদের জ্ঞানদান করতেন রাজশাহীর কবি বন্ধু ইতিহাসবেত্তা অক্ষয় মৈত্র। জ্যৈষ্ঠ পুত্র-রথীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। একই সঙ্গে আত্মরক্ষা শিক্ষার জন্য শিলাইদহে কৃষক জব্বারের কাছে লাঠি খেলার বিচিত্র কৌশল শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। পুত্রকন্যাদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শিববর্ধন বিদ্যার্ণবকে গৃহশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। পিতা নিজেও পড়াতেন তাঁদের। এ কথা বলতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের একেবারেই ব্যক্তিগত ভাবে ও পারিবারিক পরিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের 'স্মৃতিকথায়' পাই, "শিলাইদহে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে এসে বাস করতে লাগলাম কলকাতার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা থেকে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। ...বাবা, মা ও আমরা পাঁচ ভাইবোন বাড়িতে থাকব। আমার ছোটবোন রানী ও মীরা আর ছোট ভাই শমী তখনো নিতান্ত শিশু। এই নির্জনতার মধ্যে দিদি আর আমি বাবা ও মাকে আরো কাছাকাছি পেলুম। বাবা তখন আমাদের দু'জনকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিশেষভাবে নজর দিলেন। বাবা নিজে স্কুল কলেজে বিদ্যা অর্জন করেননি। কলকাতার দু'একটা স্কুলে অল্পদিনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা এত পীড়াদায়ক যে তার স্মৃতির কারণেই গোড়া থেকেই তার প্রতি কবির আপত্তি ছিল।"[২]

কবির পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ ও তৎসম্পর্কিত জীবনে ঘটা অন্যান্য এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যার দৌলতে কবি সময়ের তিরোধানে সৃষ্টি করেছেন এমন অসংখ্য চরিত্র যারা সমসাময়িক সময়ের জীবন্ত প্রতিনিধি—বিশেষতঃ রবীন্দ্র গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি যার সাক্ষ্য বহন করে। তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা অতসীলতা দেবী বা মীরার বিয়ে হয় শ্রী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে। বিয়ের তিন সপ্তাহ পরেই ১৯০৭ সালের ২৮ জুন নগেন্দ্রনাথ আমেরিকা রওনা হন। সেখানে ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির জ্যৈষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর জামাতাও কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন এবং বি.এস.সি. ডিগ্রী লাভের পর দেশে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর জামাতা পল্লী ও পল্লীবাসী কৃষিজীবীদের স্থায়ী কল্যাণ সাধনে তাঁর সঙ্গে কাজে যোগ দেন, কিন্তু বিলেত থেকে মৃত্তিকা-জীববিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষী নগেন্দ্রনাথ অন্যত্র উচ্চ জীবিকার সন্ধান শুরু করেন। তিনি কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খয়রা অধ্যাপক' হিসাবে ও কিছুকাল অন্যান্য গবেষণা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে নগেন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে বিলেতের বাসিন্দা হন। নগেন্দ্রনাথের সাথে মীরার শেষবার দেখা হয়েছিল ১৯৩২ সালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত একমাত্র পুত্র নীতিন্দ্রের অকাল মৃত্যুশয্যা পাশে। মীরার সহিত স্বামী নগেন্দ্রনাথের মনের মিল হয়নি বলে তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে গিয়েছেন আজীবন। কবি ভেবেছিলেন নীতিন্দ্রের মৃত্যুর বিপুল দুঃখভার কন্যা ও জামাতার মধ্যে দূরত্ব কমাবে। সেই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় কবি তাঁর জামাতাকে বহু চিঠিও লিখেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয়নি বরং মীরার জীবন থেকে নগেন্দ্রনাথ একেবারে মুছেই গিয়েছিলেন। কবি পরে আক্ষেপ করে বলতেন, 'সব লোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে।' নগেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে শেষবারের মতো ভারতে আসেন ১৯৫১ সালে। শেষবারের মতো ভারতে আসা হলেও নগেন্দ্রনাথের মন অল্প দিনেই অস্থির হয়ে পড়ে। অবশেষে তিনি লন্ডনে ফিরে যান। তারপর গুরুতর অসুস্থ হয়ে লন্ডনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে ১৯৫৪ সালে তিনি শ্বাসনালীর রোগে মারা যান। অপরদিকে কবির নাতনী নন্দিতার মৃত্যু হয় ১৯৬৬ সালে ও অতসীলতা দেবী বা মীরার মৃত্যু হয় ১৯৬৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে কাছে থাকা স্বল্পভাষিণী কনিষ্ঠা কন্যা অতসীলতা দেবী বা মীরাই বোনেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রানীর বিবাহ দিয়েছিলেন মাত্র ১১ বছর বয়সে। বিবাহের দু'বছরের মধ্যে রেনুকারও আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের স্মৃতিতে পাওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথের জ্যৈষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবি তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক বিধবার সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন। কবি বেলীফুল খুব পছন্দ করতেন বলে কবিভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীর নাম রেখেছিলেন 'বেলা'। বয়স চৌদ্দ পার হতে না হতেই বেলার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন পিতা রবীন্দ্রনাথ। তিনি মাধুরীর বিবাহ দেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরতের সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাবল এম.এ. পাশ করে বিহারের মজফফরপুরে ওকালতি শুরু করেন শরৎ। পরবর্তীতে শরৎ ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত চলে গেলে মাধুরী চলে আসেন পিতার কাছে। শরৎ বিলেত থেকে ফিরে এসে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সপরিবারে ছিলেন প্রায় চার বছর। তারপরই শুরু হয়েছিল ঘোর অশান্তি। স্বামী নগেন্দ্রনাথের দ্বারা নিষ্ঠুর পণপ্রথার বলি হয়েছিলেন কনিষ্ঠা কন্যা মীরা। বিয়ের পর কবিকে নগেন্দ্রনাথের আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকেও সাহায্য করতে হয়েছিল। মেয়ের শ্বশুরকে ঋণ দেওয়া ও জামাতার ভাইদের কলকাতায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল তাঁকে। কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কবি নিজ ব্যয়ে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাও শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। শারদীয় 'দেশ' ১৩৯৮ সংখ্যায় জামাতাকে লেখা কবির একাধিক চিঠিতে তাঁর ব্যক্তি অনুভবের ছবিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নানা উপলক্ষে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে 'সংঘাত প্রবল ও দুঃখকর' হয়ে উঠেছিল বলেই সে সব পত্রে জানিয়েছিলেন কবি। নানা ঘটনার আকস্মিকতায় স্নেহময় পিতা ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পাননি। ২১ আশ্বিন ১৩২৯ বঙ্গাব্দে কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "সমাজ শাসনে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের স্বাধীনতার পর্বত প্রমাণ তারতম্য দীর্ঘকালই আমাকে দুঃখ দিয়েছে—আমার রচিত অধিকাংশ ছোটগল্পের ট্রাজেডির অংশই হচ্ছে এই।" এই চিঠিতেই তিনি প্রশ্নাকারে মন্তব্য করেছেন : "আমি কি দৈবক্রমে মানবসমাজে পুরুষ মানুষের অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করিনি, এবং সেই অধিকারের স্বাধীনতা চিরদিন ভোগ করিনি? আমার তুলনায় মেয়েদের অধিকারের বাধা যেখানে, সেখানে বিচারক হয়ে ওঠার মধ্যে ভারি একটা কৃত্রিমতা আছে।"[৩] অর্থাৎ জবরদস্তি করে কিছু করতে যাননি কবি, কারণ তাঁর মনে হয়েছে 'উপর থেকে তাকে (কন্যাকে) বিচার করার আমি কে?'(তদেব) এ যেন এ প্রকৃত পিতার শালীন আচরণের অমোঘ দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে কণ্যাদের সুখ-শান্তির সঙ্গে আপোস রক্ষা করার ক্ষেত্রেও তাঁর এই ভাববাদীতা ও উদারতাগুলি স্পষ্ট হয়েছে। ছোট জামাতাকে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক নিয়োগ করার পেছনেও হয়তো এই মনোভাব কাজ করে থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে যথার্থই লেখা হয়েছে : "আর-দশজন মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে সুবিধার মুখ চেয়ে কিছু কিছু আপোস রক্ষার প্রবৃত্তি ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর মেয়েদের বিয়ের ঘটনাই এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"[৪] বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরতের সাথে মাধুরীলতার বিবাহ হয়। বারো হাজার টাকার নগদ বরপণ, প্রচুর শাড়ী-গয়না ও অন্যান্য সামগ্রী কবির কাছ থেকে আদায় করে নেন পাত্রের মা। বিহারে স্বামীগৃহে বাস করতে যান মাধুরীলতা। সে যুগের কঠিন সমাজব্যবস্থাপীড়িত ভারতবর্ষে বিহার ছিল বোধ করি সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। সেখানে ছিল পর্দাপ্রথার ভয়ংকর কড়াকড়ি, যার মধ্যে পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন কবিকন্যা। সমাজসেবায় নেমে, মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেও শ্বশুরালয়ের সেই অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারেন নি তিনি।

কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথের সাথে জ্যৈষ্ঠ জামাতা শরতের সম্পর্ক ভালো ছিল না। এ বিষয়ে কবির নির্বিকার আচরণের কারণে শরতের সঙ্গে কবির সম্পর্কের পরিণতি এক মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক অধ্যায়ে পরিণত হয়। যদিও এ বিষয়টির কোনোরূপ যৌক্তিক কারণ জানা যায়নি তবে এ কথা ঠিক যে, কবি বিদেশে থাকাকালীন তাঁর কনিষ্ঠ জামাই নগেন্দ্রনাথের সাথে শরতের মনোমালিন্য শুরু হয়। কবি ফিরে এসে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করায় রুষ্ট শরৎ স্ত্রী মাধুরীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। এরপর আর কোনদিন শরতের সঙ্গে কবির দেখা হয়নি।[৫] শোনা যায় পিতা রবীন্দ্রনাথ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত অসুস্থ কন্যা মাধুরীকে দেখতে যেতেন জামাতা শরতের অনুপস্থিতিতেই। মৃত্যুর দিনও

কবির সঙ্গে মেয়ের শেষ দেখা হয়নি, কারণ সেদিনও কবি মাধুরীর শ্বশুরালয়ের সিঁড়ি থেকে ফিরে গিয়েছিলেন জামাতাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই। রবীন্দ্রনাথের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মাত্র তের বৎসর বয়সে কলেরায় মারা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃজীবনে তিন কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানকে নিয়ে যে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশাকে নির্দোষ রূপে গণ্যপূর্বক জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনাকে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে এমনকি বিশ্বসাহিত্যেও কোনো সাহিত্যস্রষ্টার ক্ষেত্রে বিরলতম ঘটনা বলেই মনে করা হয়।[৬] বেদনা ও মৃত্যুজনিত নিদারুণ মর্মপীড়ায় ক্রমান্বয়ে সারাজীবন দগ্ধ ও বিদ্ধ হয়ে চলেছিলেন পিতা রবীন্দ্রনাথ। এই মর্মঘাতী পীড়াকে পিতা হিসাবে প্রায় সারা জীবন ধরেই বয়ে বেড়াতে হয়েছিল তাঁকে।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের সম্পর্ক পর্যালোচনায় পিতা ও কন্যার মধ্যেকার মধুর হার্দিক সম্পর্কের রূপখানিই সবথেকে বেশী পরিমানে পরিলক্ষিত হয়। মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এর কারণ হিসাবে 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স'-এর কথা উঠে এলেও আসলে কবির ব্যক্তি জীবন ও পরিবার জীবনের ছায়াও এতে মিশে আছে। ঠাকুরবাড়িতে কন্যা সন্তানরা কখনই অনাদৃত ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু করে নাট্যবিষয়ক নানা কাজ, পত্রিকা-সম্পাদনা প্রভৃতিতে যে তাঁদের অনেকেরই অনায়াস দক্ষতা ছিল স্বর্ণকুমারী দেবী, শরৎকুমারী দেবীরাই তার মস্তবড়ো প্রমাণ। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীকেও শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্য করে তোলার জন্য স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কবিগুরু তাঁর নিজের তিন মেয়ের (মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা) মধ্যে মাধুরীলতা ওরফে বেলাকে বেশি ভালবাসতেন। জাহাজে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পথে একবার তিনি চিঠিতে লিখেওছিলেন-'বেলির জন্য আমি একটা কাপড় আর পাড় কিনে মেজ বৌঠানদের সঙ্গে পাঠিয়েছি—খুব টুকটুকে লাল পাড়-বোধ হয় বেলিবুড়িকে তাতে বেশ মানাবে।' কবির এ কথার মধ্যে পিতা হিসাবে সন্তানের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ-মমতার ভাবটি চোখে পড়ে। একইভাবে তাঁর লেখা 'হৈমন্তী' গল্পে দেখি, হৈমন্তীকে তার পিতা ছোটবেলা থেকে স্নেহে-যত্নে মানুষ করেন। বাবা হিসাবে মার অভাব তিনি কখনো হৈমন্তীকে বুঝতে দেন নি। তাই হৈমন্তীর স্বভাবটিও হয়ে ওঠে তার বাবার মতোই শুভ্র ও সুন্দর। 'সমাপ্তি' গল্পে প্রাণচঞ্চল অথচ দুর্দান্ত প্রকৃতির মৃন্ময়ী সম্পর্কে গ্রামবাসী অতিষ্ঠ হলে তার সম্পর্কে লেখকের উক্তিঃ 'বাপের আদরের মেয়ে কিনা। সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর মা বন্ধুদের নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ বাপ ইহাকে ভালবাসে।' একইভাবে তাঁর 'দেনাপাওনা' গল্পের রামসুন্দর মিত্র কন্যা নিরূপমার সুখের কথা ভেবে তাকে সুপাত্রের হাতে সমর্পণ করতে বেশি টাকা পণ দিতেও রাজি হয়েছেন কারণ পিতা রামসুন্দরের কাছে তার কণ্যা ছিল নয়ণের মণি। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনি ও মিনির পিতার সম্পর্ক এবং রহমত ও তার কন্যার সম্পর্ক, 'সমাপ্তি' গল্পে পিতা ঈশানচন্দ্র ও কন্যা মৃন্ময়ীর মধ্যেকার আন্তরিক সম্পর্ক, 'সুভা' গল্পে পিতা বাণীকণ্ঠ ও তাঁর মূক কণ্যা সুভা এবং 'সম্পাদক' গল্পে মাতৃহারা প্রভা ও তার পিতার সম্পর্ক একইভাবে স্নেহ-মমতার ফ্রেমে বাঁধা।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, পিতা-পুত্রের বেলায় মধুর সম্পর্কের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-গল্পে এক বিরোধমূলক সম্পর্কের ছবি পরিলক্ষিত হয়। সেখানে পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আবার শুধু সম্পত্তি কেন্দ্রিকই নয়—তা অনেকাংশেই আদর্শগত, নীতিগত, রুচিগত, ও ভাবনাগত পার্থক্যেরও মূল হয়ে ফুটে ওঠে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের এ জটিলতা যেন অনেকটাই আজকের কালের মতো। সেদিক থেকে চিন্তা করলে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই আধুনিক প্রজন্মের ব্যবধান ও পিতা অপেক্ষা পুত্রের মনের প্রগতিশীল ভাবনাকে তাঁর গল্পে স্পষ্ট করে গেছেন। তাঁর লেখা 'দেনাপাওনা' (১২৯৮) গল্পে পিতা রায়বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের আপাত বিরোধ দৃশ্যতঃ দৃষ্টিভঙ্গিগত হলেও আসলে তা প্রজন্মগত ব্যবধানেরই ফল। গল্পে দেখি, পনেরো টাকা নিয়ে বিবাহসভায় যখন গোলযোগ বাঁধে, তখন বর হঠাৎই তার বাপকে বলে বসে- 'কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।' একথা শুনে বাপও বলে—'দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।'[৭] এই মতপার্থক্যকে প্রবীণেরা আধুনিক পুত্রের শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষার প্রভৃতির অভাব বলে মনে করলেও তাতে শুধু প্রজন্মের ফারাকই নেই, বরং এমন এক আধুনিক ও প্রগতিপন্থী ভাবনা জড়িয়ে আছে যা সর্বদা সাধুবাদযোগ্য।

অন্যদিকে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮) গল্পে সম্পত্তি নিয়ে পিতা রামকানাই ও পুত্র নবদ্বীপের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে এবং সম্পত্তি হাতানোর জন্য পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র জাল উইলের আশ্রয় নিলেও পিতা রামকানাই-এর নীতিবোধ ও সততা তাকে সমর্থন জানায় নি। তাই পিতা হয়েও রামকানাই আদালতে পুত্রের প্রতারণা ও মিথ্যাকে ফাঁস করে দিয়ে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। এহেন ট্রাজিক বিচ্ছেদ পিতা-পুত্রের বিরোধের মাত্রাকে যতটা না চেনায় তার থেকেও গল্পে বড় হয়ে ওঠে পিতার সত্যিকারের সততা ও নিষ্ঠা। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পে অর্থ-সম্পদ লিপ্সু অসৎ পিতা গৌরসুন্দরের কুটিল মনোভাব পুত্র বিভূতিভূষণের উদারতার কাছে শেষপর্যন্ত হার মানে। 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১)গল্পটির শুরুতেই আছে গোলমালের প্রসঙ্গ-'এই পরিবারটির মধ্যে কোনো রকমের গোল বাঁধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিতে কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাঁধিল।' গল্পের এ গোল আসলে পিতা-পুত্রের বিরোধ যা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি ও বংশের বিরোধে পরিণত হয়। গল্পে দেখি, পুত্র বনোয়ারীলাল আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে পরিবার ছেড়ে চাকরির অন্বেষণে বেরিয়েছে আর গল্পের শেষে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে পুত্র বনোয়ারীলালের বিচ্যুতি পিতা-পুত্রের বিরোধের মাত্রাকে তীব্রতর করে তুলেছে। এছাড়াও রবীন্দ্র-গল্পে ভাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'শাস্তি' (১৩০০), 'পণরক্ষা' (১৩১৮), 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮), 'ব্যবধান', 'দান-প্রতিদান'-এর মতো গল্পে।

শুধু পিতা-পুত্র নয়, মাতা-পুত্র সম্পর্কের মাঝেও সেই একই বিরোধাভাসকে খুঁজে পাই গল্পগুচ্ছের কয়েকটি গল্পে। মাতা-পুত্র সম্পর্কের মধ্যে দুটি আলাদা প্রকৃতির মাধুর্যহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতা খুঁজে পাওয়া যায় 'দেনাপাওনা' ও 'ছুটি' গল্প দুটিতে। 'দেনাপাওনা' গল্পের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্র নিরূপমাকে বিয়ে করে প্রবাসে চলে যান। বহু দিন পর পুত্র প্রবাস থেকে নববধূর খোঁজ নিলে মা তাকে কোনোরূপ ভৎর্সনা করেন না, বরং পুত্রের লাভজনক দ্বিতীয় বিয়ের কথা পেড়ে বলেন—'বাবা, তোমার জন্যে আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।' অতঃপর লেখকের কথায় জানা যায় দ্বিতীয় বিয়ের নেপথ্য রহস্য—'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।'[৮] এতে মায়ের মনের অভিসন্ধিও পরিষ্কার হয়ে যায়। যে মা নারী, সংসারের রক্ষাকর্ত্রী, যিনি সদাই পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেন—সেই মা কি এত নির্দয় হতে পারেন? নিজের সন্তানের সাথে সাথে তিনি তো কণ্যাসমা নিরূপমারও শাশুড়ি মাতা! তবুও দেখি, নিজের নির্লজ্জ অর্থলালসা পূরণ করতে মা এখানে তাঁর পুত্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন আর তার এহেন আচরণে নিজেই নিজেকে কালিমালিপ্ত করেছেন। অন্যদিকে 'ছুটি' গল্পে ফটিকের বিধবা মা ছোট ছেলে মাখনকে বাড়িতে রেখে বড় ছেলে ফটিককে শাসন করতে কলকাতায় তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন। পল্লী প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপ ছেড়ে ইট কাঠ পাথুরে পরিবেশে ফটিকের বন্দীদশা হয় অকল্পনীয়। অত্যাচারিণী, অবিচারিণী মায়ের এই নির্বাসন দণ্ড ফটিকের অকাল মৃত্যু ডেকে আনে। গল্পের একেবারে শেষে ফটিক মৃত্যুর আগে বলে যায়— 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'[৯] ফটিকের এই মন্তব্যে কি মাতা-পুত্র সম্পর্কের আর কোনো অবশিষ্ট মধুর তাৎপর্য লুকিয়ে থাকে? বরং এ তো স্পষ্টতঃই মাতার প্রতি পুত্রের এক তীব্র অভিমান! 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে আমরা নবদ্বীপচন্দ্রের যে মাকে দেখতে পাই, সেও তো এক সম্পদলিপ্সু, নীতিহীন ও সুযোগসন্ধানী মা। পিতা রামকানাই যেখানে সততা বজায় রেখে কাজ করতে চান, মাতা সেখানে সকল ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে পুত্র নবদ্বীপচন্দ্রের জ্যাঠামশাই-এর সম্পত্তি হস্তগত করতে চান। রবীন্দ্র-গল্পে পিতা-পুত্র অথবা মাতা-পুত্রের সম্পর্কের এই অস্বাভাবিক জটিলতা আমাদের অবাক করে। কিন্ত কেন এই জটিলতা?

উপরোক্ত গল্পগুলিকে সামনে রেখে, গভীর অভিনিবেশ সহকারে কবির বাল্যজীবনখানি চিন্তা করলে অথবা তার সামগ্রিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই উপলব্ধি হয় যে, রবীন্দ্র অঙ্কিত পিতা-পুত্র অথবা মাতা-পুত্রের এহেন আচরণের পিছনে কবির শৈশব জীবনের অপ্রাপ্তিজনিত অভিমান ও তজ্জনিত প্রাক্ষোভিক প্রতিফলন অথবা তার প্রতিক্রিয়ার প্রভাব এ গল্পগুলিতে কিছুমাত্রায় পড়লেও পড়তে পারে। কবির জীবনে জমিদার পিতা দেবেন্দ্রনাথের মহিমময় ব্যস্ত জীবনের দূরত্ব এবং বহু প্রসবিনী মাতা সারদাদেবীর স্নেহ-পরিচর্যার অভাব তো ছিলই!

মাতৃ অঙ্ক থেকে নির্বাসিত বালক রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ভৃত্য রাজতন্ত্রের মধ্যেই বেড়ে উঠেন। সেজন্যই হয়তো ব্যক্তি জীবনের পিতা-পুত্র অথবা মাতা-পুত্রের সম্পর্কের ধূসরতা ও জটিলতা নানাভাবে তাঁর ছোটগল্পে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র গল্পে বাৎসল্য সম্পর্কের এক চমৎকার উদাহরণ হলো 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮) গল্পটি। তবে এই বাৎসল্য রসও প্রপিতামহ, পিতা অথবা পিতৃসম ব্যক্তিত্ব এবং কণ্যার মধ্যেকার পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহস্রোতে যতটা প্রবাহিত হয়েছে ['সম্পত্তি সমর্পণ' (১২৯৮), 'কাবুলিওয়ালা' (১২৯৯) প্রভৃতি গল্পে] পিতা-পুত্র, অথবা মাতা-পুত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। বরং সেদিক থেকে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটি প্রায় পিতা-পুত্র সম্পর্কের মতোই অনেকগুলি রবীন্দ্র-গল্পে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহধারায় প্রবাহিত হতে পেরেছে। এর বড় কারণটিও বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য পরিবৃত ছেলেবেলার জীবন। ছোটবেলায় কবি প্রধানতঃ এদেরই আদরে ও শাসনে প্রতিপালিত হন। পরবর্তীতে তাই হয়তো ঠাকুর পরিবারের ভৃত্য কিশোরী চাটুয্যে, খাজাঞ্চি কৈলাস, ভৃত্য ঈশ্বর প্রমুখ তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে তাঁর 'হালদার গোষ্ঠী', 'প্রতিহিংসা' (১৩০২), 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (১২৯৮) প্রভৃতি গল্পে বাস্তবের মায়া-মমতা ও ভালোবাসা সমেত উঠে এসেছে।

বাস্তব জীবনে কবির পিতাকে দেখার অমর অভিজ্ঞতা গ্রথিত হয়ে আছে রবীন্দ্রজীবনী থেকে শুরু করে গগনেন্দ্রনাথের রং-তুলিতে। রবি ঠাকুরের পিতৃদেব যেন তাঁর কাছে থেকেও দূরে, দূরে থেকেও দূরে। জীবনস্মৃতির পাতায় কবি লেখেনঃ "পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকর-বাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।"[১০] ছোটবেলার সেই দূরত্ব অনেকটাই ঘুচিয়ে দিয়েছিল হিমালয়যাত্রা। 'পিতা' নামক যে মানুষটি আসলে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের মতোই নিশ্চল আর গম্ভীর তাঁরই সাথে পাহাড় যাত্রার সুযোগ পিতা-পুত্রের পাহাড়-প্রমাণ ব্যবধান যেন এক ধাক্কায় অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল। জীবনস্মৃতির অলংকরণে পিতা-পুত্রের সেই সুমধুর পর্বত-প্রবাসের ছবি এঁকেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর আঁকা সেই কল্পচিত্রটিই সম্ভবতঃ পিতার সহিত কবির অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একমাত্র ছবি।

গগন ঠাকুরের এ ছবিটি যেন পিতা, পুত্র ও প্রকৃতির ভাবসমন্বয়ের এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, ত্রয়ীর এক ধীর, স্থির অথচ প্রবহমান সংযোগের আশ্চর্য মিশেল! প্রসঙ্গত বলা যায়, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের একসঙ্গে কোনো আলোকচিত্র আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে অনির্বচনীয় রূপময়তা ধরা পড়ে এর সাদা-কালো রং-এর ব্যবহারে। কোনো রকমের বর্ণবাহুল্য ছাড়াই শিল্পীর চোখ আর অনন্য তুলির ছোঁয়া এ অংকনচিত্রটিকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে। আবছায়া চরিত্রগুলি ও তার আবহ স্বরূপ বারান্দার উপর কৌণিকভাবে এসে পড়া জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোটিও প্রায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেটিই যেন এ ছবির এক স্নিগ্ধ—শান্ত পটভূমি, যা পিতা-পুত্রের হিমালয়-যাত্রাপর্বে পিতার তুষার-কঠিন ব্যক্তিত্বের বরফকেও মোমের মতো তিল তিল করে গলিয়েছে। এ অসামান্য আলোর আবহ সেই চেতনালোককেই মূর্ত করে তোলে যা কোনো অচীন গগনলোক থেকে ভেসে আসা প্রার্থিত মুক্তির আনন্দে বিধৌত, উদ্ভাসিত। চিরন্তন সম্পর্কের বন্ধন তার বাস্তবতার সমস্ত গণ্ডীকে অগ্রাহ্য আর অতিক্রম করে যেন শিল্পীর ইল্যুউমিনেশনের মৌনমুখর আবেগে উড়ান দিতে চেয়েছে স্বপ্ন-সম্ভব কল্পনালোকে। একদিকে মঙ্গলালোকের সে অপরূপ জগতে, আনন্দযজ্ঞে পিতা আর শুধু পিতা নন, তিনি হৃদয়ের সারাৎসার, বরেণ্য অতিথি—অপরিমেয় সত্যসুন্দর আর অন্যদিকে পুত্রের অবারিত ও সার্থক মুক্তি তাঁরই আলোয় আলোয়। এরই সাথে মিলিয়ে বরেণ্য-শব্দবন্ধে কবি যখন বলেনঃ "যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত, পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে... ...।"[১১] কবির এ কথাসূত্রে আমরা বুঝতে পারি, দুধ-সাদা কাঞ্চনজংঘার কোলে নেমে আসা সন্ধ্যা শুধু সন্ধ্যা নয়, তার মধ্যে আছে সুর, ভাষা, আলো, মুক্তি আর সবে মিলে এক পরম নির্ভরতা; কবির শব্দবন্ধ যোগালো যার ভাষা, সঙ্গীত শোনালো যার মুক্তি, গগন দেখালো যার আলো—আর সবকিছু মিলে জন্ম হলো যে প্রশান্তির তার শ্বেতসৌকর্য কম কিছু নয়, কারন সে যে সমুজ্জ্বল তুষারকান্তি হিমালয়ের মতো জমাট নয়—

তা কুসুম কোমল এক পিতৃহৃদয়েরই ভাষা যার অধিতল পেতে গেলে কঠিন খোলস ভেঙে তার অতি নিকটে যেতে হয়, পৌঁছতে হয় চিরআকাঙ্খার অবারিত হৃদমাঝারে।

বিভূতিভূষণ একাধারে সাহিত্যিক, অনন্য কথাকার— অন্যদিকে প্রকৃতিনিষ্ঠ এক জীবনশিল্পী। তাঁর গল্প-উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে 'পথের পাঁচালি'-র কথা। অপুর বাবা হরিহর রায় নিশ্চিন্দিপুরের পৈত্রিক ভিটেয় তাঁর বৃহৎ পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। পরিবারের তীব্র অর্থসংকটের সময়েও তিনি তাঁর প্রাপ্য বেতন আদায় করার জন্য নিয়োগকর্তাকে তাগাদা দিতে পারেন না। হরিহরের স্ত্রী সর্বজয়া তাঁর দুই সন্তান দুর্গা ও অপু এবং হরিহরের এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি ইন্দির ঠাকরুনের দেখাশোনা করেন। গ্রামে ভালো উপার্জন করতে সক্ষম না হওয়ায় হরিহর একটা ভালো কাজের আশায় শহরে যায়। হরিহরের অনুপস্থিতিতে গৃহের অর্থসংকট তীব্রতর হয়। কিন্তু এতকিছু আলোড়নও বালক অপুর প্রকৃতিময় চিন্তার জগতে কিছুমাত্র দাগ কাটেনা। আর অন্যদিকে শহরগামী পিতা হরিহরের ভাবনায়ঃ 'অপু বাড়ি হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে তাহার জন্য একখানা 'পদ্মাপুরাণ' কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালোবাসে।'[১২] চরম অভাবের মাঝেও সামান্য এই চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে পিতা-পুত্রের স্নেহ-প্রীতিময় সৌহার্দ্যের ছবিটি কিন্তু অতুলনীয়।

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনও ছিল তাঁর সৃষ্টি অপুর পিতা হরিহরের মতোই অতি সাধারণ মানের, ধরণটা ছিল এমন যে— আমি এই ভাবে, এই বেশে পৃথিবীতে এসেছি, আমার এই সম্বল—তোমরা আমায় ভালবেসে গ্রহণ করো তো ভালো, না হলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। অথচ ১৯৫০-এর ১লা নভেম্বর ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর ঘাটশিলার বাড়ি, ব্যারাকপুরের সম্পত্তি ও বই-এর রয়্যালটি মিলিয়ে ছিল প্রায় গোটা একটা সাম্রাজ্য! বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। মৃতের স্ত্রী তখন স্বামীর সম্পত্তি পেতেন না, কেবল পেতেন সন্তানের ভরণপোষনের দায়িত্ব। কিন্তু তারাদাস তখন শিশুমাত্র। বিভূতি-পত্নী রমাদেবী ও তাঁর পিতা ষোড়শী কান্ত চট্টোপাধ্যায় তখন এলেন গজেন্দ্র নাথ মিত্রের পরামর্শ নিতে। গজেন্দ্র নাথের শ্যালক নিরঞ্জন চক্রবর্তী ছিলেন চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট। তিনিও কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন ষোড়শীবাবুকে। অতঃপর গজেনবাবু ষোড়শীবাবুকে পরামর্শ দেন যে তিনি যেন রমাদেবীকে গোটা সম্পত্তির এক্সিকিউটার করার জন্য হাইকোর্টে আপিল করেন ও যতদিন তা না হয় ততদিন রমাদেবী ও বাবলুকে (তারাদাসের ডাক নাম) যেন পক্ষীমাতার মতোই আগলে রাখেন। গজেনবাবুর পরামর্শ মতো ষোড়শীবাবু হাইকোর্টে আপিল করলে অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই রমাদেবী বিভূতিভূষণের যাবতীয় সম্পত্তির এক্সিকিউট্রিক্স হন ও উত্তরাধিকারী তারাদাসের হয়ে সব কিছু দেখাশোনা করেন।[১৩] ১৯৫৬ সালে হিন্দু কোড বিল পাশ হবার পর রমাদেবী ও তারাদাস যৌথভাবে বিভূতিভূষণের সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। Telegraph পত্রিকার সংবাদ সূত্র অনুযায়ী[১৪] তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা থাকাকালীন ঝাড়খন্ডের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডাকে লেখা তাঁর চিঠিতে বিভূতিভূষণের ঘাটশিলার প্রায় দশ একর জায়গা সহ 'গৌরীকুঞ্জ' নামক একতলা বাড়িটি স্মৃতি-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারে পরিণত করার প্রস্তাব জানিয়ে তা অধিগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। এজন্য তারাদাস তাঁর পিতার ব্যবহার্য বস্তু, বইপত্র ও প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্রগুলিও সরকারকে দান করেন।

বিভূতি-পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ জীবনে সরকারি কর্মের পাশাপাশি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, গল্পকার। বিভূতিভূষণের মৃত্যুকালে তারাদাস ছিলেন সাড়ে তিন বৎসরের শিশু মাত্র। সুতরাং ঐ সময়ের কথা পরিণত কালে তাঁর পক্ষে মনে রাখাও সম্ভব নয়। তবে তাঁর 'কাজল' উপন্যাস (পৃ.৫, ৬ ও ৯ দ্রষ্টব্য) এবং সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে দেওয়া ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় ধরা আছে পিতৃস্মৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু অনুভব। তেমনই এক বর্ণনাঃ "এই সময় বাবার কথা মনে পড়ে খুব। রাণুপিসি পাশে ঘুমাইতেছে। পিসির নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। জানালার বাহিরে উঠানে সেই অপার্থিব চাঁদের আলোর দেশ। এ সময় বাবা থাকিলে বেশ হইত। মনের যে ভাবই হোকনা কেন, বাবাকে বুঝাইয়া বলিবার দরকার পড়ে না—বাবা নিজেই কেমন সব বুঝিয়া লয়। বাবা

হয়তো বলিতে পারিত কেন সে এমন অদ্ভুত চিন্তা করে। শুধু এসব কারণেই নহে—অন্য কারণও আছে। হ্যাঁ, সে লুকাইবে না—বাবাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, বাবার জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে।"[১৫] ছোট্ট কাজলের এ অনুভূতি যেন কিশোর তারাদাসের নিজেরও। অন্যত্র বিভূতিভূষণের সেই গভীর পুত্র-প্রীতির কথা বলেছেন স্ত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর ভাষায়ঃ "উনি নিজে আমাকে বলেছেন, একসময়ে নাকি উনি সন্তান—সন্তান করে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বহু লোকের কাছে শুনেছি, অনেককে উনি নাকি বলতেন—আমাকে বাবা ডাকবি? -ডাক্ না! আরও শুনেছি, এই পিতৃ সম্বোধন শুনবার জন্য নানাপ্রকার ঘুষও দিতেন কাউকে কাউকে।"[১৬] একসময় রেণু নামে তাঁর এক ধর্ম মেয়েও ছিল যার কথা তারাদাস রচিত 'কাজল' উপন্যাসেও পাওয়া যায়। ঘাটশিলায় থাকাকালীন 'ফুলডুংরী'-র পিছনে বনের ভিতর এক বিরাট পাথরের উপর বসে তিনি লিখতেন। মৃত্যুর আগেও তাঁর সে স্বভাব যায়নি। মাঝে মাঝে উপাসনাও করতেন সেখানে, স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন কখনো সখনো। বাড়িতে স্নান করতেন না কখনোই, ঘাটশিলায় থাকাকালীন নদী অথবা নানা পুকুরে সারতেন স্নান। কখনো কখনো বাবলুকেও (তারাদাস) স্নানে নিয়ে যেতেন তাঁর সাথে, এর প্রভাব তারাদাস রচিত 'কাজল' উপন্যাসেও পড়েছে ('কাজল' উপন্যাস, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ.৩ দ্রষ্টব্য)। ঘাটশিলায় তাঁর মৃত্যুর পাঁচ-ছদিন আগে ছেলের জন্য তাঁর টানখানি কি তীব্র হয়ে উঠেছিল তা ধরা পড়ে রমা দেবীর কথায়। রমা দেবী বলেনঃ "বেলাশেষে আমি বসেছিলাম আমাদের বারান্দার চওড়া সিঁড়ির ওপর। উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনে। বাবলু উঠোনের ঘাসের ওপর ওর বাবাকে নিয়ে খেলছিল। আজও বড় বেশি করে সেই দিনটির কথা, সেই অপরাহ্ন বেলাটির কথা আমার মনে পড়ে। উনি সে সময়ে আমাকে বললেন—তুমি আমার দিকে একদম নজর দাও না। আমি কখন কি করি বলতো? এদিকে আমার 'কাজল' শুরু করতে হবে। বাবলুকে নিয়ে কী যে করি! তুমি শুধু শুধু বাবলুকে আমার কাছে দাও। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। সে কী গো, আমিই বরং ছেলেটাকে কাছে পাইনে, শুধু তুমি ওকে নিয়ে ঘুর'ছ কোথায় কোথায়! ওর দুর্বল স্বাস্থ্য—কোথায় আমি ভাবছি, ওর কি স্বাস্থ্য টিঁকবে!"[১৭] অন্যদিকে পিতা সম্পর্কে পুত্র বাবলুর অসীম আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। রমা দেবীর কথায়ঃ "বাবলু যখন একটু বড় হলো এবং স্কুলে যেতে শুরু করলো তখন বাবার কথা শুনতে চাইতো। তাঁর লেখার বিষয়, তাঁর ভালো-লাগা, তাঁর জীবনচর্চাও জানতে চাইতো। তন্ময় হয়ে শুনতো এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতো সব কিছু।"[১৮] তাঁর এ বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় তারাদাসের জীবনে তাঁর পিতার অমোঘ প্রভাব ছিল শিশুকাল থেকেই।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিবাহের পর বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক ৪১ নং মির্জা গালিব স্ট্রীটের 'প্যারাডাইস লজ্'-এ থাকতেন। সেইসময় তিনি তাঁর বেশকিছু বই-খাতা ও কাগজপত্র পাঠিয়ে দেন তাঁর দেশের বাড়ি গোপালনগর ব্যারাকপুরে। তাঁর ঘাটশীলার বাড়িতে একটি বিলিতি কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের ক্যালেন্ডারে আঁকা একটি শিশুর ছবি দেখেই নাকি তাঁর 'কাজল' চরিত্রটির পরিকল্পনা। এক কোমল, সুন্দর, নিষ্পাপ, রূপবান ও দেবসুলভ কাজল, যে ছিল তাঁর কল্পনার রাজপুত্র—স্বভাবে, সৌরভে সে তাঁর পিতা অপুরই স্বগোত্র। ১৩৫৭ সালের ২৮শে ভাদ্র বিভূতিভূষণের জীবিতাবস্থায় শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বন্ধুবর মনোজ বসু, সুমথ নাথ ঘোষ, ডা: নলীনাক্ষ সান্যাল, গজেন্দ্র নাথ মিত্র, বেগম জাহান-আরা-খান প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের সমাগম হয়। সেসময় অতিথিবর্গ মিলে তাঁকে একখানি খাতা উপহার দেন—যার সুন্দর করে বাঁধানো কালো কভারটার উপর সোনালী অক্ষরে ইংরেজীতে খুব যত্ন করে লেখা ছিল 'কাজল' কথাটি। সেই সময়েই ঠিক হয়ে যায় অবিলম্বে তাঁকে লিখতে হবে 'কাজল' আর লেখা শুরু হলেই তা ধারাবাহিক ভাবে বের হবে কোনো একটি পত্রিকায়।[১৯]

বানভট্টের লেখা 'কাদম্বরী'-র অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেছিলেন তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট। আর বিভূতিভূষণের যেমন ছিল 'অপু', তেমনই ছিল তারাদাসের 'কাজল'। অপুর্বের পুত্র 'কাজল'-এর পরিকল্পনা একসময়ে ছিল বিভূতিভূষণেরই। কিন্তু তিনি তা শুরুই করে যেতে পারেননি, আর বিভূতিভূষণের মনে 'কাজল' চরিত্র নিয়ে যে স্বপ্নময় অনুভূতি ঘনীভূত হয়েছিল বাস্তব প্রেক্ষিতে তার সবটা জুড়েই ছিল তাঁরই সাড়ে তিন বছরের শিশুপুত্র বাবলু ওরফে তারাদাস।

অন্যদিকে, সর্বত্রই বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি'-র প্রসঙ্গই প্রথম আলোচিত হয়। অথচ বিভূতিভূষণের 'দেবযান' লেখবার ইচ্ছা ছিল 'পথের পাঁচালী'রও আগে, আর প্রথমদিকে 'দেবযান'-এর নাম ছিল 'দেবতার ব্যথা'। কি লিখবেন তা ভেবে ছোট ছোট স্কেচও করে রাখতেন তিনি। পরে ঐ স্কেচগুলি দেখলেই কি লিখবেন তা মনে পড়ে যেত তাঁর। তাঁর 'পথের পাঁচালি'-র শিকড়েই আছে লেখকের অকৃত্রিম প্রকৃতিপ্রেম। সেই প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ সম্পর্কে রমাদেবী বলেনঃ "উনি ছিলেন চিরদিনের ছাত্র। প্রকৃতির এই মহিমময়—অনন্ত ঐশ্বর্যভরা পরিবেশ, এর ভিতরে আত্মহারা ছিলেন তিনি। প্রকৃতি পাগল বিভূতিভূষণ।"[২০] কখনও কখনও কাউকে না জানিয়ে ভোর রাতে বেরিয়ে পড়তেন বিভূতিভূষণ, যেতেন বনে, পাহাড়ে—যেখানে সদাই নির্জনতা। উপাসনা সারতেন শিলাসনে। তারপর শুরু হতো লেখা। সঙ্গে রাখতেন সর্বক্ষণের সঙ্গী নোটবইটি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ অভ্যাস বজায় ছিল। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের এই একনিষ্ঠতা ও সর্বময় বিলীনতা যে ধমনীস্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল পুত্র তারাদাসেও তা টের পাওয়া যায় বিভূতির 'পথের পাঁচালি' কিম্বা 'অপরাজিত' গ্রন্থদুটির পাশাপাশি তারাদাসের 'কাজল'—এমনকি 'গ্রামবাংলার মাঠঘাট' কিম্বা 'পথপ্রান্তরে' গ্রন্থগুলি রাখলেই। অপু আর কাজলের ছন্নছাড়া মনোভূমিও যে বিভূতি-তারাদাস নামক পিতা-পুত্রের মনোভূমির মতই একই ভাবে উদাস করা প্রকৃতিপ্রেমী আর চেনা-অচেনা মানুষপ্রেমী তা দেখতে পাই 'কাজল' এর একাংশে যেখানে তারাদাস বলেনঃ "শীত শেষ হইয়া বসন্তের বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। পুরাতন পাতা ঝরিয়া গিয়া গাছে নতুন কচি পাতার সমারোহ। এই দিনগুলাতে কাজলের বেশিক্ষণ বাড়িতে মন বসে না—বিশেষতঃ বৈকালের দিকে। সূর্য বাঁশবনের মাথা ছাড়াইয়া একটু নামিলেই রোদটা কেমন রাঙা রাঙা আর আরামদায়ক হইয়া আসে। রাণুপিসিদের গাইটা অলস মধ্যাহ্নে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাসলতা খায়। কাজল উত্তরের জানালায় বসিয়া লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ পরে তাহার আর মন টেঁকে না—বাহিরে যাইবার জন্য ছটপট করিতে থাকে। বন্য লতাপাতার যে বিশেষ ঘ্রাণটা বাতাসে বহিয়া আসে—সেটাই যেন তাহাকে আরো চঞ্চল করিয়া তোলে। গন্ধটার সহিত এই বাহিরে যাইবার ইচ্ছার যে কী সম্পর্ক—তাহা সে বুঝিতে পারে না, কেমন যেন রহস্যময় ভাব হয় মনে।"[২১] তবে পিতার Mystic কিম্বা Supernatural অনুভূতিগুলিই যে তারাদাসকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা তারাদাসের লেখা 'তারানাথ তান্ত্রিক' কিম্বা 'অলাতচক্র'-এর গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়। বিভূতি-ভাষ্যের নিরিখে অপুর প্রকৃতি তন্ময়তা নিয়ে এ যাবৎ অসংখ্য আলোচনা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায়, শুধুমাত্র তাঁর 'কাজল-কল্পনা' ঘিরেই পুত্র ও প্রকৃতির নিবিড় উন্মেষখানি মৃত্যুর কিছুকাল আগেও তাঁর মনে কতখানি জড়িয়েছিল, কতখানি ছড়িয়েছিল তার জাদুকরী সম্মোহন তার পরিচয় মেলে রমাদেবীর কথায়। রমা দেবী বলেনঃ "কাজল উপন্যাস সম্পর্কে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে আকাশের নব নব ছায়ারূপ দেখতে দেখতে সন্ধ্যাবেলায় বিলবিলের ধারে ঠেসদেয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে করতে আলোচনা করতেন। কাজল এখন কত বড় হয়েছে, কী করছে, কী ভাবছে, এসব আলোচনা করতেন। বাবলু তারাদাস হওয়ার পরে মুহূর্তে মুহূর্তে বাবলুকে দেখা চাই। বাবলু কি করছে, কেমন অঙ্গভঙ্গী করছে—সর্বদা বাড়িতে সকলকে ডেকে দেখাতে ভালোবাসতেন। সর্দার খেলুড়ের সঙ্গে বাবলু যেন ছিল শিশু-খেলুড়ে। বুঝতে পারতাম, 'কাজল' উপন্যাসের পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে।"[২২] অথচ বিভূতিভূষণের সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার আগেই প্রয়াণ ঘটে তাঁর। বহুদিন পর মায়ের উৎসাহে কিশোর পুত্র তারাদাস তাঁর সে পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদান করেন। 'কাজল' উপন্যাসের একস্থানে দেখি কাজলের ভাবনায় লেখক তারাদাস বলেনঃ "একটা খাতায় দুইটি গল্প লিখিয়া সে বন্ধুদের পড়াইয়াছিল। কলেজের বন্ধুদের (বেশি মিল না থাকা সত্ত্বেও দুই-একটি বন্ধু তাহার হইয়াছে) মধ্যে অনেকেই তাহার বাবার ভক্ত। তাহারা গল্প দুইটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল—ভালই হয়েছে, মন্দ কী! তবে ব্যাপার কী জানো, লেখার মধ্যে তোমার বাবার প্রভাব বড্ড বেশী। কাজল মহা হাঙ্গামায় পড়িয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়া বাবার বই দেখিয়া নকল করিতেছে না। তাহার চিন্তাধারার সহিত বাবার চিন্তাধারা মিলিয়া গেলে সে কী করিতে পারে?"[২৩] এ কথা কয়টি যেন তারাদাসের নিজের জীবনের ক্ষেত্রেও এক আসল সত্য বলে মনে হয়।

বিভূতিভূষণের 'দেবযান' প্রভৃতি গ্রন্থ তো বটেই এমনকি তারাদাসের কথাতেও জানা যায় বিভূতিভূষণ Spiritualism-এ শুধু বিশ্বাসীই ছিলেন না, প্রকৃতিধর্মের মধ্যেও প্রায়শঃই তিনি তাঁর এই Spiritualism-এর রূপকে প্রত্যক্ষায়িত করতেন। তাঁর 'দেবযান' এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত বহু দিনলিপিতেও তাঁর এই গভীর বিশ্বাস ও উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিভূতিভূষণ নিজেও পৃথিবীর এই প্রকৃতিধর্ম সম্পর্কে একস্থানে বলেনঃ "এই পৃথিবীর একটা Spiritual Nature আছে। আমরা এর গাছপালা, ফুল-ফল, আলো-ছায়া, আকাশ-বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে, শৈশব থেকে এদের ঘনিষ্ট পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি অনুভব করা আমাদের বড় কঠিন হয়ে পড়ে।"[২৪] বিভূতিভূষণের নিজের অতিলৌকিক বিশ্বাসটি কেমন ছিল সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তারাদাস বলেনঃ "বিভূতিভূষণ পরলোকে তো বিশ্বাসী ছিলেনই উপরন্তু তিনি বলতেন আমাদের এই দৃশ্যমান বিশ্বজগতের ভেতরেই আরো অনেক জীবজগৎ ছড়িয়ে রয়েছে, যা সময়ের অন্য ডাইমেনসনে অবস্থিত এবং কাজে কাজেই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তাঁর 'দেবযান' এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত বহু দিনলিপিতে এই গভীর বিশ্বাস ও উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।"[২৫] বিভূতিভূষণের অন্তরে এই অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস জন্মেছিল বস্তুচেতনার গভীরে প্রবেশের ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ ইচ্ছাকল্পের জোরেই। তিনি যতখানি subjective ছিলেন, তার চেয়েও বেশী ছিলেন objective আর তাই বলতে পেরেছিলেনঃ "ওপারের সঙ্গে এপারের একটা যোগ আছে। আছেই আছে। মৃত্যু এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের কাছে শোকের জিনিস। কিন্তু শোক তো এই ভেবে—মৃত্যু একটা অন্ধকার সম্পর্কহীন বিচ্ছেদ। তা যদি না হয়!"[২৬] এই ঔৎসুক্যের স্পন্দন যখন চিন্তাশীল মনে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে তখনই বোঝা সম্ভব হয়, তাঁর অতিপ্রাকৃতিক সত্তার বোধ সময়ের ডাইমেনশনে— একই স্পেসে (Space) বহু সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী আর তারা সকলেই অবস্থান করছে একই সাথে—পৃথক যাদের ব্যক্তিত্ব অথবা অস্তিত্ব, অদৃশ্যও; সময়ের নূন্যতম পার্থক্যের মধ্যে জীবনের এদিকে আর ওদিকে নানাতর তার অবস্থান, হয়তো বা আরও বেশী কিন্তু তাকে কখনও অস্বীকার করা যায় না। সেই ব্যবধানটা খালি চোখে দেখাও যায় না, অথচ তার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে, দর্শন বা বিজ্ঞানের বিদেশী শাখা যাকে ইতিপূর্বেই তাদের চর্চার বিষয় করে নিয়েছে।

পিতা-পুত্রের সম্পর্কের বন্ধন যে মৃত্যুর পরেও শেষ হয়না— তা যেমন মিশে থাকে পুত্রের আবেগ বিভোর চিন্তনে তেমনই তা প্রলম্বিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সীমাহীন প্রকৃতির অকৃত্রিম আনন্দময় সৌন্দর্য শিখায়। তা যে এক জন্ম থেকে উঠে এসে আর এক প্রজন্মকে বাঁচার পথ দেখায়, অনন্তের আলো হয়ে জ্বলে থাকে হৃদয়ের অক্ষত স্বয়ম্ভূতে, একইভাবে তা ভাস্বর হয়ে ওঠে বাস্তবের পিতা-পুত্রের লেখা উপন্যাসের দুটি ভিন্ন পুত্র-চরিত্র ও চিত্রে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'-র একত্রিংশ পরিচ্ছেদে হরিহরের মৃত্যুর পর শ্মশানের পটভূমিতে পুত্র অপুর বিবরণে লেখক বলেনঃ "মনিকর্ণিকার ঘাটে সংস্কার অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠান্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাঁহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্ত দিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিকচিক করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে—কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শষ্যশালিনী.../লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ... যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মনিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,--রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মতো কোথায় বসিয়া যেন উদাস পুরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে—কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শষ্যশালিনী.../লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ..."[২৭] এ শুধু সারি দেওয়া কালো অক্ষরের সুরে ঔপন্যাসিক কথকতামাত্র নয়, মৃত্যুর চিরন্তন সত্য উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে শাশ্বত জীবনসত্যের আলোয় আলোয় ফেরা এক চিরন্তন শ্রুতি যা এক মৃত্যুতে শেষ হয়না, সহস্র সহস্র জন্ম-মৃত্যু স্রোতের মধ্যে দিয়ে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে লীন হয়ে থাকে, আশা হয়ে—আলো হয়ে বিশ্ব মানবসমাজকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়। এরই পাশাপাশি আমরা রাখতে পারি অপুর মৃত্যুর পর কাজলের মানসিক অভিব্যক্তিটুকুকে। লেখকের ভাষায়ঃ "দাহ শেষ

করিয়া শেষরাত্রে সবাই ফিরিল। খাটের পায়ার কাছে হৈমন্তী একভাবে বসিয়া আছে, একটুও নড়ে নাই। দিন তাহার চোখের সামনেই রাত্রি হইয়াছিল, আবার রাত্রিও ভোর হইতে চলিল। সবাই অবাক হইল কাজলকে দেখিয়া। শ্মশানে সে মুখাগ্নি করিয়াছে অত্যন্ত শান্তভাবে। ফিরিয়া সেই যে জানালায় দাঁড়াইল, পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আর সেখান হইতে নড়িল না। পাশের বাড়ির ওভারসিয়ারবাবুর স্ত্রী আসিয়া সারারাত হৈমন্তীর কাছে বসিয়াছিলেন। তিনি পর্যন্ত কাজলের নিস্পৃহতা দেখিয়া অবাক হইলেন।... ... দুপুরে কাজল অপুর লেখার ঘরে গিয়া বসিল। সমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটা বড় খামের ভিতর টেবিলের উপর রাখা। টেবিলের এ কোণে বাবার চুল আঁচড়াইবার যশোরের চিরুনিখানা, তাহাতে বাবার কয়েকটা চুল এখনও জড়াইয়া আছে। ঘাড়ের কাছে ময়লা হইয়া যাওয়া দুইটা জামা দেয়ালের পেরেকে ঝুলিতেছে। এসব দেখিতে দেখিতে কাজল জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সূর্যটা কেমন করুণাহীন—কাহারও দুঃখের সমব্যথী নহে। সমস্ত দিন কেবল ঘুরিতেছে। একটা মাকড়সা দু দেয়ালের কোণে জাল বুনিতেছে অখণ্ড মনোযোগে।"[২৮] আজ যে পুত্র, কাল সেই-ই পিতা, আর সেই পিতাকেও একদিন তারই চেনা পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে যেতে হয় চির স্নেহবাঞ্ছিত পুত্রটির কাছ থেকেও। তবু অখণ্ড গতিতে কালচক্র ঘুরে চলে একটানা—ঘটমান, অদৃশ্য প্রকৃতির নিয়মেই, মৃত্যুও যার চলাকে স্তব্ধ করতে পারে না এক মূহুর্তের তরে, সেই শাশ্বত সত্যকেই একইভাবে প্রতিভাত হতে দেখি এখানেও। তারাদাসের 'কাজল' উপন্যাসে এমন বেশ কিছু অংশ রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে জন্ম-মৃত্যুর সুমহান ঐতিহ্যে প্লাবিত হয়েও লেখক পৌঁছতে চান প্রজন্ম বাহিত পিতা-পুত্রের সম্পর্কের এমনই এক দোলায়িত ভাববিন্দুতে, পৌঁছতে চান এমনই চিরন্তন, দার্শনিক অভিব্যক্তির পথে যা প্রকৃতি, প্রেম আর মানবসত্যের চিরায়ত সংমিশ্রণে এক অত্যাশ্চর্য আলোকপর্ণ হয়ে জেগে থাকে আমাদের হৃদয়বৃন্তে। বিভূতিভূষণের মানসপুত্র অপুর মৃত্যুদৃশ্য তারাদাসের 'কাজল' উপন্যাসেঃ "একটা ঢিল তুলিয়া জোরে নদীর দিকে ছুঁড়িল, বেশ জোরে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিল বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। সামনে হইতে জোরে ধাক্কা মারিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবে বুকে হাত দিয়া কিছুটা ছিটকাইয়া পিছনে সরিয়া আসিল। মুহূর্তে মাথা কী রকম খালি হইয়া গেল। সূর্যটা যেন একবার কাছে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে। অপু অনুভব করিল, পা দুইটা তাহাকে আর দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। পাথরটার গায়ে হেলান দিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। ব্যথাটা বাড়িতেছে—শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। খুব গভীর ঘুম আসিবার আগে যেমন হয়, শরীরে তেমনি অবসাদের ভাব। দেহে-মনে অবসাদ মাকড়সার জালের মতো জড়াইয়াছে। সে কি এইখানে একটু ঘুমাইবে? বাবা বাড়ি আসিয়া বলিতেছে দুর্গা কই? তার জন্য শাড়ি কিনে এনেছি যে—বাবা থলির ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির করিতেছে। ... ... ঘুম—ঘুম—ঘুম। বুক বাহিয়া চিনচিনে ব্যথাটা উপরে উঠিতেছে। যন্ত্রণা ততটা আর বোধ হইতেছে না, তাহার খুব ঘুম পাইয়াছে।"[২৯] আর তার সাথেই তীব্রতা পায় মৃত্যুকালীন আরো এক মহা অনুভবঃ "—খোকা কোথায় গেল, খোকা? আমার পাশে আয়—এইখানটায়। কোল ঘেঁষে বোস, উঠে যাসনে কোথাও। আমি তোকে কোলকাতা থেকে সেই বইটা এনে দেবো এবার। উঠে যাস নে বাবা আমার—তোকে না দেখে আমি যে মোটে থাকতে পারি নে।"[৩০] বলাইবাহুল্য অপুর এই মৃত্যুদৃশ্যেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার বাবা। জন্ম-মৃত্যুর এই আবহমান প্রবাহধারায় যখন মৃত্যুস্রোত এসে হানে আঘাত, তখনও সেই কোন্ কালে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিরা এসে জীবনের সব না পাওয়ার অনুভূতি আর ব্যথাহত ফাঁকগুলো জুড়ে দিতে চায়, আর সকল পার্থিবতারা মিলে-মিশে একাকার হয়ে শেষে স্বপ্নের পানশি বেয়ে পিতা-পুত্রের সেই ভাবসম্মিলনের দেশে হারিয়ে যেতে চায়।

প্রসঙ্গ শেষ করবো 'কাজল'-এরই একটি অনুপম বর্ণনা দিয়ে। পিতা-পুত্রের আশ্চর্য সে মিলন লেখকের অপূর্ব ভাষায়ঃ "সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়াছিল—কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। সুন্দর একটা ছায়াঘন আমেজে গ্রামটা ঝিমাইতেছিল। পাখির ডাক শোনা যাইতেছিল কম। কেবল বহু উঁচুতে প্রায় মেঘের গায়ে গায়ে কয়েকটা চিল উড়িতেছিল। কাদের মিঞার ক্ষেতের পাশে কাজল একবার থামিল। কাদের তাহার শালার সহিত নিড়েন দিতেছে ক্ষেতে। কাজলকে দেখিয়া কাদেরের শালা বলিল—বাড়ি চলে যাও কর্তাবাবা—বিষ্টি হতি পারে। কাদের আপত্তি করিয়া বলিল—পানি হবে না মোটে—দেখছো না চিল উড়ছে ওপরে। ডানায় পানি পালি নামি আসত নিচপানে।

আবহাওয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের আলাপ করিতে দিয়া কাজল হাঁটিতে লাগিল মেঠোপথ ধরিয়া। ঐ পথটা গিয়াছে আষাঢু—এই পথটা ঘুরিয়া গিয়াছে নদীর দিকে। একটা বড় গাছ রহিয়াছে দুইটা পথের সঙ্গমস্থলে। জায়গাটা কাজলের বড় ভাল লাগে। গ্রামের যাবতীয় লোক এই পথ দিয়া আষাঢুর হাটে গিয়া থাকে। অচেনা লোকও যায় কত। ভিন-গাঁ হইতে মালপত্র কাঁধে করিয়া আলের পথ, মাঠের পথ ধরিয়া এখানে আসে। এখান হইতে কাঁচা পথ ধরিয়া চলিয়া যায় হাটে। পণ্যাদি কাঁধে হাটমুখী জনস্রোত দেখিতে কাজলের বেশ লাগে। খানিকক্ষণ সেখানে বসিয়া কাজল একবার নদীর পথে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিল একজন লোক আষাঢুর পথ হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। বুকটা তাহার একবার কেমন করিয়া উঠিল। দৌড়াইয়া আগাইয়া গেল সে—এইবার লোকটার পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে শব্দটা যেন জিভ দিয়া আর বাহির হইতেছে না। মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে। পথের পাশে জঙ্গল হইতে বাতাস অজস্র বন্যপুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। একটা ধাক্কা দিয়া কাজল শব্দটা বাহির করিল—বাবা! অপু বিদ্যুৎপৃষ্ঠের ন্যায় ফিরিয়া তাকাইল। এই ডাকটার জন্য সে ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত হইতে। সমুদ্রের ফেনোচ্ছল উর্মিমালা, বিষূবমন্ডলীর দেশের তারকাখচিত তমিস্র রাত্রির আকর্ষণ, উষ্ণ বালুকায় শুইয়া উপরে নারিকেল পাতায় বাতাসের মর্মরধ্বনি শুনিবার অদ্ভুত অনুভূতি—সব সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এই ডাকটা শুনিবার লোভেই তো! সে থাকিতে পারে নাই। অপুর হাত হইতে ব্যাগ আর বাক্স পড়িয়া গেল ধূলায়। পথের মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে দুই হাত সামনে বাড়াইয়া দিয়া চোখ বুঁজিল। পরক্ষণেই কাজল ঝাঁপাইয়া পড়িল অপুর বাহুবন্ধনে। চিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছিল নিচে। এইবার বৃষ্টি নামিবে।"[৩১] অদ্ভুত ও অবিস্মরণীয় এ বর্ণনায় শুধু পিতা-পুত্রের মিলনই নয়—তার জের প্রকৃতি, মানুষ ও মানব সমাজের সেই অলক্ষ্য কোণটিকেও ছুঁয়ে যায় যেখানে পিতার সহজ স্নেহসিক্ত অনুভব আর নিসর্গের সজল বিমুগ্ধতা মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে সেই একমেবদ্বিতীয় মানুষী সত্ত্বায়—আর তা স্পষ্ট করে সেই চিরায়ত মানবসম্পর্ককেই যার সকল অস্তিত্ব জুড়ে অতল সমুদ্র আর সুবিশাল নভস্তল আবহমানকালব্যপী পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্র জীবনী ও সাহিত্য প্রবেশক (১ম খণ্ড), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৯৫৩, কলকাতা দ্রষ্টব্য
২. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল, আনন্দ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, জুলাই ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১২৫ দ্রষ্টব্য
৩. দেশ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৮, পৃ. ৫৩, কলকাতায় প্রকাশিত সাপ্তাহিকে কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি দ্রষ্টব্য
৪. আনিসুজ্জামান, 'রবীন্দ্রনাথ' সার্ধশত জন্মবার্ষিকী, বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ৪৬, সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দ্রষ্টব্য
৫. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল, আনন্দ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, জুলাই ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১২৫ দ্রষ্টব্য
৬. তিতাশ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সংসার, মেঘবাহন, ১ম বর্ষ, বিজয় দিবস সংখ্যা, পৌষ ১৪০৮ দ্রষ্টব্য
৭. 'দেনাপাওনা', রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য
৮. তদেব
৯. 'ছুটি', রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য
১০. 'জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য
১১. তদেব
১২. 'পথের পাঁচালী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য
১৩. 'কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর', দ্বিতীয় খন্ড, সবিতেন্দ্রনাথ রায় দ্রষ্টব্য

১৪. Museum Plans for literary icon abode, Navtan Kumar, The Telegraph, June 24, 2004 দ্রষ্টব্য
১৫. 'কাজল', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫ দ্রষ্টব্য
১৬. তদেব, ভূমিকা, রমা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য
১৭. তদেব
১৮. তদেব
১৯. তদেব
২০. তদেব
২১. 'কাজল', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩ দ্রষ্টব্য
২২. 'কাজল', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, ভূমিকা, রমা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য
২৩. 'কাজল', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, পৃ. ৯১ দ্রষ্টব্য
২৪. তৃণাঙ্কুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫. বিশ্বাসের ওপারে, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃত, ১লা জুলাই, ১৯৭৭
২৬. বিভূতিভূষণের সঙ্গে কিছুক্ষণ, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭
২৭. 'পথের পাঁচালী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য
২৮. 'কাজল', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, পৃ. ৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য
২৯. তদেব পৃ. ৫৬ দ্রষ্টব্য
৩০. তদেব পৃ. ৫৭ দ্রষ্টব্য
৩১. 'কাজল', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০ দ্রষ্টব্য

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা:

১. 'রবীন্দ্র জীবনী ও সাহিত্য প্রবেশক' (১ম খণ্ড), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৯৫৩, কলকাতা।
২. 'রবীন্দ্রনাথের সংসার', তিতাশ চৌধুরী, মেঘবাহন, প্রথম বর্ষ, বিজয় দিবস সংখ্যা, পৌষ ১৪০৮
৩. 'ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল', চিত্রা দেব, আনন্দ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, জুলাই ২০০৬, কলকাতা
৪. 'রবীন্দ্রনাথ' সার্ধশত জন্মবার্ষিকী, আনিসুজ্জামান, বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ৪৬, সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৫. রবীন্দ্রকাব্য পাঠের ভূমিকা, কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, বিশ্ববিদ্যালয় সিরিজ, ব্রাক প্রকাশনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩
৬. 'ছিন্নপত্রাবলী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন
৭. রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ, আবুল আহসান চৌধুরী, ৯ মে, ১৯৯০, ঢাকা
৮. পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯. রবীন্দ্র মানস ও শিক্ষা, শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
১০. স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
১১. মৃত্যু মিছিলে রবীন্দ্রনাথ, সুখময় সেনগুপ্ত, মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
১২. রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান, দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা
১৩. আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১৪. ঠাকুর বাড়ির কথা, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা
১৫. রবির কর, সন্তোষ কুমার ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
১৬. রবীন্দ্র ছোটগল্পে পারিবারিক সম্পর্কের চালচিত্র, আবদুর রহিম গাজী
১৭. পিতা ও পুত্র, ভেরা পানোভা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৪, অনুবাদ শিউলী মজুমদার
১৮. বিভূতিভূষণের দুটি দিক, শতবর্ষে বিভূতিভূষণ, সংবাদ প্রতিদিন, ৯ই আশ্বিন, ১৪০০
১৯. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ভূদেব চৌধুরী
২০. চিরন্তন অরণ্যের সন্তান, শতবর্ষে বিভূতিভূষণ, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, সংবাদ প্রতিদিন, ৯ই আশ্বিন, ১৪০০
২১. আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, রচয়িতা গুপ্ত, আন্ডারকভার, প্রতিদিন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬, রবিবার
২২. 'কাজল', তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
২৩. কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর, দ্বিতীয় খন্ড, সবিতেন্দ্রনাথ রায়, প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৪১৩, বইমেলা ২০০৭, দীপশিখা প্রকাশন, কলকাতা

ইংরাজি:

1. Museum Plans for literary icon abode, Navtan Kumar, The Telegraph, June 24, 2004

পত্র-পত্রিকা:

১.'দেশ' শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৮
২. সুন্দরম, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক, কামরুল ইসলাম (সম্পাদনা), ১৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২১